ইউনিট ৭

উমাইয়া ও আব্বাসীয় সরকার পদ্ধতি

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা পদ্ধতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ, পুলিশ বিভাগসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। উমাইয়া খিলাফতকাল ছিল প্রায় ১০০ বছর এবং আব্বাসীয় খিলাফতকাল ছিল প্রায় ৫০০ বছর। এই দীর্ঘ শাসনামলে তারা বহু জনহিতকর কাজ সম্পাদন করেন।

এই ইউনিটের বিষয়গুলোকে নিম্নের কয়েকটি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠগুলো হল-

- ❖ পাঠ ঃ ১ উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি
- ❖ পাঠ ঃ ২ উমাইয়াদের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি
- ❖ পাঠ ঃ ৩ উমাইয়া সরকারের বৈশিষ্ট্য
- ❖ পাঠ ঃ ৪ আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি
- ❖ পাঠ ঃ ৫ আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি
- ❖ পাঠ ঃ ৬ আব্বাসীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

পাঠ ঃ ১ উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা পারবেন।
- ◆ উমাইয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা দীওয়ান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

উমাইয়া যুগের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রকৃত আরবীয় শাসনব্যবস্থা। খলীফা প্রথম উমরের (রা) আমলে যে ইসলামী শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া যুগে নানা প্রকার সংস্কারের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। আরব মুসলিমগণ শাসক শ্রেণী হিসেবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় সে আমলে উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার খুব শক্তিশালী ছিল এবং শাসিত জাতিসমূহ একটি পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। উমাইয়া যুগের সরকার পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল যথা- কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি। নিম্নে উমাইয়া আমলের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

কেন্দ্রীয় সরকার ঃ উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ছিলেন স্বয়ং খলীফা। খোলাফায়ে রাশেদূনের খলীফা থেকে উমাইয়া খলীফার বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুআবিয়া (রা) স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে প্রকৃতপক্ষে রোমান ও সাসানীয় পদ্ধতির রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া শাসকগণ রাজা ছিলেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে বসে রাজকার্য সম্পাদন করতেন।

খলীফাগণ নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী ঃ উমাইয়া খলীফাগণ ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। নীতি নির্ধারণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা কারোও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে খলীফাগণ মজলিসে্ শূরার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অনেক বিষয় আলোচনা করতেন। কিন্তু মুআবিয়া (রা) উক্ত মজলিসে শূরা বাতিল করে দেন এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করেন।

রাজকীয় রীতির পরিবর্তন ঃ খোলাফায়ে রাশেদূনের খলীফাদের ন্যায় উমাইয়া খলীফাগণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন না। সিরিয়ায় আমীর মুআবিয়া (রা) সাসানীয় ও রোমান পদ্ধতিতে দরবারের ব্যবস্থা করেন। মুআবিয়াই সর্বপ্রথম খলীফা যিনি দেহরক্ষী নিয়োগ করেন এবং নামায আদায়ের জন্য মসজিদে নিরাপত্তা কক্ষ নির্মাণ করেন। এভাবে খলীফা কার্যতঃ মহানবীর খলীফা না হয়ে উমাইয়া যুগে রাজা হয়ে পড়েন। উমাইয়া খলীফা উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) খলীফা প্রথম উমরের ন্যায় শূরা ভিত্তিক সরকার গঠন করেন। তিনি সাধারণভাবে জীবন যাপন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী উমাইয়া খলীফাগণ পূনরায় রাজতন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী গ্রহণ করেন এবং রোমান ও সাসানীয় সম্রাটদের ন্যায় রাজ দরবার প্রতিষ্ঠা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও ক্ষমতার চর্চা করতেন।

বংশানুক্রমিক মনোনয়ন ঃ উমাইয়া খলীফাদের রাজকীয় মর্যাদার বিকাশ ঘটে উত্তরাধিকার (অলী আহাদ) মনোনয়নের মাধ্যমে। খলীফা মুআবিয়া (রা) নিজ পুত্র প্রথম ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। ইয়াযীদও মৃত্যুকালে তদীয় জৈষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মুআবিয়াকে মনোনীত করে যান। নিজ পুত্রকে মনোনীত করার মাধ্যমে কার্যত উমাইয়া খলীফাগণ খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন। মারওয়ান ও তাঁর পুত্র আবদুল মালিকের সময় খলীফার ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রকাশ পায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে। মারওয়ানই প্রথম মুসলিম খলীফা ছিলেন যিনি সামরিক ক্ষমতা ও কুটকৌশলে খিলাফত দখল করেন। আবদুল মালিকও সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মারওয়ানের সময় থেকে উমাইয়া খলীফাদের মনোনয়নের ধারায় নতুন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মারওয়ান তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে মনোনীত করে যান। আবদুল মালিক স্বীয় পুত্র ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে মনোনীত করেছিলেন। সুলায়মান তাঁর চাচাত ভ্রাতা উমর ইবন আবদুল আযীয ও ভ্রাতা ইয়াযীদ ইবন আবদুল মালিককে মনোনীত করেন। দ্বিতীয়

ইয়াযীদ মৃত্যুকালে স্বীয় ভ্রাতা হিশাম ইবন আব্দুল মালিক ও পুত্র ওয়ালীদকে মনোনীত করেছিলেন। এভাবে সুফিয়ানী উমাইয়াদের সময় একজন মাত্র অলী আহাদ (উত্তরাধিকার) নিযুক্তির প্রথা বদল হয়ে মারওয়ানী উমাইয়াদের আমলে দু'জন অলী আহাদ (উত্তরাধিকার) নিযুক্তির প্রথা দাঁড়ায়। অলী আহাদ নিযুক্তির এ প্রথা সাসানীয় ও রোমানদের ন্যায় রাজতন্ত্র ও রাজকীয় ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশকেই নির্দেশ করে।

সাম্রাজ্যের মধ্যে খলীফাই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। আইনগতভাবে খলীফা রাজধানীর মসজিদের প্রধান ইমাম, সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের প্রধান পরিচালক, বিচার বিভাগের প্রধান কাযী এবং বেসামরিক ও সামরিক শাখাসহ অন্যান্য সকল দপ্তরের প্রধান ছিলেন।

দীওয়ান বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা ঃ উমাইয়া খলীফাগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সেই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে তাঁরা পাঁচটি প্রধান দীওয়ানে বিভক্ত করেন। কেন্দ্রের সেই দীওয়ান তত্ত্বাবধানের জন্য খলীফাগণ এক একজন প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। নিজ নিজ কার্যের জন্য উক্ত কর্মকর্তা (সাহিব) খোদ খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। দীওয়ানগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ ছিল ঃ

১। দীওয়ান আল-জুন্দ্ (সামরিক দপ্তর) ঃ উমাইয়া খলীফাগণ স্বয়ং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উক্ত বিভাগের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনের সময় সৈন্য পরিচালনার জন্য একজন প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। ভাতা প্রাপকদের তালিকায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত থাকত। উক্ত প্রথা ত্রুটিযুক্ত ছিল। সৈন্যগণ মনে করত, তারা বেতন পাচ্ছে না, ভাতা পাচ্ছে। তা ছাড়া সে যুগে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সামরিক বাহিনীতে চাকুরী করা অপরিহার্য ছিল এবং সে কারণে সকল মুসলমানকে সরকারী ভাতা দেয়া হতো। কিন্তু কার্যতঃ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত না ; হয়ত বা কোন প্রতিনিধি, বা কৃতদাসকে দিয়ে ভাতা ভোগী তার সামরিক দায়িত্ব পালন করিয়ে নিত। খলীফা হিশাম সেই কুপ্রথা রহিত করেন এবং ভাতা প্রদানের স্থলে সৈন্যদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনী নিয়োগ দেয়া ও তাদের তালিকা সংরক্ষণ। সৈন্যবাহিনী গোত্রীয় ভিত্তিতে নিয়োগ হতো এবং তাদের কার্যাবলী যথারীতি কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কার্যত খলীফা ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান এবং কেন্দ্র কর্তৃক তাদের বেতন বা ভাতা নির্ধারিত হতো।

২। দীওয়ান আল্-খারাজ (ভূমিরাজস্ব দপ্তর) ঃ উমাইয়া যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব বিভাগ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো সাহিবু-দীওয়ান আল-খারাজ বা সাহিব আল-খারাজ (Director of the finance Department)| স্বয়ং খলীফা কর্তৃক তিনি নিয়োগ হতেন এবং তাঁর কার্যাবলীর জন্য খলীফার নিকট তিনি দায়ী থাকতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দীওয়ান আল-খারাজে সংরক্ষিত থাকত। প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রদেশের আয় হতে প্রাদেশিক ব্যয় নির্বাহ করে অবশিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর বা দীওয়ান আল-খারাজে জমা দিতেন। এ বিভাগ হতে উমাইয়া খলীফাগণ সাম্রাজ্যের যাবতীয় জনহিতকর কার্যাবলির ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থ বায়তুলমালে জমা হত সাহিব আল-খারাজ তা পৃথক করে রাখতেন।

৩। দীওয়ান আল-খাতাম (রেজিস্ট্রি দপ্তর) ঃ খলীফা মুআবিয়া (রা) দীওয়ান আল-খাতাম প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল খলীফার হুকুম নিয়ম মাফিক রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে মূল কপি সীল করতঃ যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা। তৎপূর্বে সরকারী নির্দেশনাবলী বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের সময় সতর্কতা অবলম্বন না করে সরাসরি মূল কপি গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করা হতো। তাতে অনেক সময় খলীফার আদেশ পত্র জাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। খলীফা মুআবিয়া (রা) একদা আমর ইবন যুবায়রকে ১,০০,০০০ দিরহাম প্রদানের জন্য যীয়াদ ইবন আবীহকে নির্দেশ প্রদান করেন ও উক্ত পত্র আমরের হাতে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে আমর উক্ত অঙ্ক বদল করে ২,০০,০০০ দিরহাম করেন ও তা যিয়াদকে প্রদান করে দুইলক্ষ দিরহাম গ্রহণ করেন। এ জাল পরে ধরা পড়ে ও আমরকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র উক্ত অর্থ প্রদান করে ভ্রাতা আমরকে মুক্ত করেন। এ ঘটনার পর মুআবিয়া (রা) দীওয়ান আল-খাতাম প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগে খলীফার আদেশ পত্রের অফিস কপি রেখে মূল কপি সীল মোহর করে গন্তব্যস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। খলীফা আবদুল মালিকের আমলে এই বিভাগ পূর্ণতা লাভ করে। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে সাহিবু দীওয়ান-আল-খাতাম বলা হতো। আব্বাসীয় যুগে এ বিভাগকে দীওয়ান আল-তাওকী বা দীওয়ান আল-ইন্শা বলা হতো।

৪। দীওয়ান আল-বারীদ (ডাক বিভাগ) ঃ উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ মুআবিয়া (রা) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে সরকারী কাজের জন্যই এ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে প্রজা সাধারণও ডাক বিভাগের উপকারীতা লাভ করে।রাজধানী দামেস্ক হতে প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীকে সংযোজনকারী প্রধান প্রধান রাজপথগুলোকে ১২ মাইল অন্তর অন্তর মঞ্জিলে (Stages) বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি মঞ্জিলে সরকারী ডাক-অশ্ব বা ডাক-উষ্ট্র সহ সরকারী দূত নিয়োগ থাকত। রিলে (Relay) পদ্ধতিতে সরকারী দূতগণ অতি দ্রুত সরকারী পত্রাদি নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছিয়ে দিতো। বিশেষভাবে আরব ও সিরিয়াতে ডাকের জন্য উষ্ট্র ব্যবহার করা হতো। ডাকের জন্য নির্দিষ্ট অশ্ব বা উষ্ট্রের লেজ কেটে দিয়ে চিহ্নিত করা হতো।

খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান ঘোড়-ডাকের উন্নতি বিধান করেন। কালক্রমে পোস্টমাস্টারদেরকে তাদের সাধারণ দায়িত্ব ব্যতিরেকে গোয়েন্দাগীরীর দায়িত্বও দেয়া হয়। পোস্টমাস্টারগণ তাদের এলাকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন তথ্য গোপনে খলীফাকে অবগত করতো। ডাকের ঘোড়াগুলো ডাক বাহন ছাড়াও সময় সময় সরকারী অফিসারদের দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর কাজ করত। এমনকি জরুরী অবস্থায় ডাক-ঘোড়ার সাহায্যে জরুরীভিত্তিতে সৈন্য প্রেরণের কাজ করানো হতো। ঘোড়াগুলো ৫০ হতে ১০০ জন সৈন্য স্থানান্তরিত করতে পারত। ডাক বিভাগ ছিল ব্যয় বহুল বিভাগ। ডঃ হুসায়নী বলেন, ইউসুফ ইবন উমারের শাসনকালে কেবল ইরাকের ডাক বিভাগের জন্য ৪,০০০,০০ দিরহাম ব্যয় হতো।

দীওয়ান আল-বারীদের প্রধান কর্মকর্তাকে সাহিব্ আল-বারীদ বলা হতো। প্রাদেশিক অফিসারদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকায় সাহিব আল-বারীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রতিটি জেলা হতে পত্রাদি ও সংবাদপত্র প্রথমে স্থানীয় সাহিব আল-বারীদের নিকট পৌঁছত। তিনি সেগুলো সমন্বিত করে দ্রুত রিলে পদ্ধতিতে রাজধানীর সদর দপ্তরে প্রেরণ করতেন। সেখানে প্রধান সাহিব আল-বারীদ সেগুলো সমন্বিত করে খলীফার নিকট উপস্থাপন করতেন। তা ছাড়া প্রধান পোস্টমাস্টার (সাহিব আল-বারীদ) প্রধান প্রধান শহরে ডাক কর্মচারী, বিভাগীয় সম্পাদক, ডাক পিয়ন প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারতেন। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল নিয়মিত বেতন সরবরাহ করা। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের ন্যায় তাঁর গুরুদায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ সকল ঘটনার সংবাদ সরবরাহ করা। পোষ্টমাস্টারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রাস্তাঘাটের খবর, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান, বিভিন্ন অঞ্চলে এবং রাজপথের আশে-পাশে কৃষির অবস্থা, পথের পাশের শহর ও গ্রামাদির বিবরণ সংরক্ষণ করতে হতো। পোস্টমাস্টার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় এ সকল খবর ও বিবরণ সংগ্রহের ফলে মুসলমানগণ ভূগোল বিদ্যায় পারদর্শীতালাভ করে ও ভূগোল বিদ্যার উন্নতি হয়। সুলতান আলপ্-আর-সালান মন্ত্রী নিযামুল মুলকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রহিত করেন।

৫। দীওয়ান আল-রাসায়িল (সরকারী পত্র রচনা বিভাগ) ঃ খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান দীওয়ান আল-রাসায়িল প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল সরকারী চিঠি পত্রাদি রচনা করা ও তার ভাষা মার্জিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করা। সরকারী পত্রাদি লিখন, ঘোষণাবলীকে মার্জিত ভাষায় প্রকাশ ও ইস্তেহারাদির প্রচার ছিল এই বিভাগের কাজ। তা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও ছিল দীওয়ান আল-রাসায়িল এর কাজ। ডঃ হুসায়নী উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় মারওয়ানের সচিব (Secretary) আব্দুল হামীদ এ বিষযে সর্বোৎকৃষ্ট বাক্যালংকার প্রয়োগ করেন।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন

১. উমাইয়া সরকার পদ্ধতি বিভক্ত ছিল-

ক. দুই ভাগে; খ. চার ভাগে;
গ. ছয় ভাগে; ঘ. পাঁচ ভাগে।

২. কোন উমাইয়া খলীফা সর্বপ্রথম দেহরক্ষী নিয়োগ দান করেন?

ক. প্রথম ইয়াযীদ; খ. হযরত মুআবিয়া (রা);
গ. আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ান; ঘ. উমর ইবন আবদুল আযীয।

৩. দীওয়ান আল জুনদ অর্থ হল-

ক. ডাক বিভাগ, খ. অর্থবিভাগ;
গ. সামরিক বিভাগ; ঘ. ভূমি রাজস্ব বিভাগ।

৪. কোন খলীফা দীওয়ান আল-খাতাম প্রতিষ্ঠা করেন?

ক. খলীফা উমর (রা); খ.খলীফা দ্বিতীয় উমর (রা);
গ. খলীফা মুআবিয়া (রা), ঘ. খলীফা ইবনে হিশাম।

৫. দীওয়ান আর-রাসাইল প্রতিষ্ঠা করেন-

ক. খলীফা মুআবিয়া (রা); খ. হযরত উসমান (রা),
গ. খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান; ঘ. খলীফা সুলায়মান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি কেমন ছিল সংক্ষেপে লিখুন।
২. দীওয়ান আল-জুনদ ও দীওয়ান আল-খারায সম্বন্ধে লিখুন।
৩. দীওয়ান আল খাতাম সম্বন্ধে লিখুন।
৪. দীওয়ান আল-বারীদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২ উমাইয়াদের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ◆ উমাইয়া সরকারের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজধানীর নাম বলতে পারবেন;
- ◆ প্রাদেশিক দীওয়ান-এর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ ওয়ালীর কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ প্রাদেশিক বিভিন্ন কর্মকর্তার পদবী ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

উমাইয়া সরকারের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

উমাইয়া শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এতবড় বিশাল সাম্রাজ্য রাজধানী দামেস্ক হতে সাফল্যজনকভাবে শাসন করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এ কারণে উমাইয়া খলীফাগণ সাম্রাজ্যকে প্রশাসনের জন্য ১৪টি বড় বড় প্রদেশে (ইক্লীম) এবং প্রদেশগুলোকে সর্বমোট ৭৯টি জেলায় বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশকে উপযুক্ত পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন সহ প্রদেশ শাসনের জন্য ওয়ালী বা আমীর এবং জেলা শাসনের জন্য আমিল নিয়োগ করা হতো। খলীফা মুআবিয়া (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সাধারণ প্রশাসন হতে রাজস্ব বিভাগকে পৃথক করেন এবং রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত প্রদেশে সাহিব আল্-খারাজ (রাজস্ব অফিসার) উপাধিধারী অফিসার নিয়োগ করেন। উমাইয়া শাসনকালে প্রদেশের আদায়কৃত রাজস্ব হতে প্রাদেশিক খরচ বাদে অবশিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় ধনাগারে (বায়তুল মাল) জমা দেয়া হতো। কেন্দ্রে প্রদানের পরও প্রাদেশিক ধনাগারে প্রচুর অর্থ জমা থাকত।

উমাইয়া আমলে দুই শ্রেণীর ওয়ালী ছিল বলে জানা যায়। বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য উমাইয়া সাম্রাজ্য ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এ সকল অঞ্চলে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে খলীফা পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে যে সকল ওয়ালী নিয়োগ করতেন, তাঁরাই ছিলেন ভাইসরয়। এ অঞ্চলগুলো রাজধানীর নামসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

নাম	রাজধানী
১। ইরাক	কুফা
২। আল-হিজায	মদীনা
৩। আল-জাযীরা	মৌসুল
৪। মিসর	ফুস্তাত্
৫। ইফরিকীয়া	কায়রোয়ান

বিভক্ত প্রদেশ ও রাজধানী

ভাইসরয়গণ খলীফার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ বা পদচ্যুতকরণ, উপহার প্রদান বা শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সকল কার্জ করতে পারতেন। নিম্নে বিভক্ত প্রদেশগুলোর নাম ও রাজধানী উল্লেখ করা হল।

প্রদেশ	রাজধানী
১। আরব	মক্কা
২। আল-ইরাক	কুফা
৩। আল-জাযীরা	মৌসুল
৪। সিরিয়া	দামেস্ক
৫। মিসর	ফুস্তাত্
৬। আল-মাগরিব্	কায়রোয়ান
৭। পূর্ব প্রদেশ (পূর্ব প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।	
(ক) মাওয়ারা আল-নাহর	সমরকান্দ
(খ) খুরাসান	মার্ভ
৮। আল-দাইলাম্	দাইলাম
৯। আল-রিহাব্	আযারবাইযান

১০। আল-জিবাল্	হামাযান্
১১। খুজিস্তান (আহোয়ায্)	জুনদেসাপুর
১২। ফারস্	শিরাজ
১৩। কারমান	সীরজান
১৪। সিন্ধু প্রদেশ	মানসূরা

প্রাদেশিক দীওয়ান

কেন্দ্রের ন্যায় প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রধানত ৩টি দীওয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। দীওয়ানগুলো ছিল যথাক্রমে-

১। **দীওয়ান আল-জুন্দ বা সামরিক দপ্তর ঃ** এটি প্রাদেশিক সামরিক বাহিনীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতো।

২। **দীওয়ান আল-রাসায়িল বা যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন দপ্তর ঃ** বস্তুত প্রদেশে এই দপ্তরই ছিল প্রধান দপ্তর। সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য এই দীওয়ানের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দপ্তরের ভাষা প্রথম হতেই আরবী ছিল।

৩। **দীওয়ান আল-মুস্তাগিল্লাহ বা রাজস্ব বিভাগ ঃ** প্রদেশের সকল রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসেব এই বিভাগে সংরক্ষিত হতো।

কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের সকল নথীপত্রই প্রাদেশিক গভর্ণরের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকত। প্রদেশে প্রদেশে দীওয়ান আল-বারীদের কাজ সুচারুরূপেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা কেন্দ্রীয় দীওয়ান আল-বারীদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো।

উমাইয়া যুগে প্রাদেশিক আমীর বা ওয়ালীর কার্যাবলী ঃ উমাইয়া যুগে প্রাদেশিক প্রশাসককে আমীর বা ওয়ালী বলা হতো। খলীফা সাধারণত প্রদেশের স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রশাসন বিষয়ে সকল ক্ষমতা দিয়ে প্রদেশ শাসনের জন্য আমীর বা ওয়ালী নিয়োগ করতেন। কেন্দ্রে খলীফা যেমন স্বয়ং সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা, প্রধান মসজিদের ইমাম, বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান এবং বিচার বিভাগের প্রধান বিচারক, তেমনি প্রদেশে আমীর ছিলেন প্রদেশের প্রধান সেনাপতি, প্রধান বেসামরিক প্রশাসক, প্রধান রাজস্ব অফিসার, প্রধান বিচারক ও প্রধান মসজিদের ইমাম। ওয়ালী প্রদেশের সকল উচ্চপদস্থ অফিসার নিয়োগ করতেন। তিনি রাজস্ব অফিসার বা ভূমি রাজস্ব অফিসার বা সাহিব্ আল-খারাজ, দীওয়ান-সচিব, পুলিশ অফিসার বা সাহিব আল-আহদাস, বিচারক বা কাযী, প্রাদেশিক অফিসার ও জেলা প্রশাসক নিয়োগ করতেন। তাঁর কার্যাবলীর জন্য তিনি সরাসরি খলীফার কাছে দায়ী থাকতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে খলীফা কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রাদেশিক অফিসার নিয়োগ করতেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়ালী খলীফার অনুমোদনক্রমে প্রাদেশিক অফিসারদের নিয়োগ করতেন।

সাহিব আল-খারাজঃ ভূমি রাজস্ব অফিসার বা সাহিব্ আল-খারাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। প্রথম দিকে সাহিব-আল খারাজ নামক কোন অফিসারের পদ ছিল না। কারণ তখন খারাজী ভূমি খুব স্বল্প পরিমাণ ছিল। পরবর্তীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে দীওয়ান আল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উক্ত বিভাগ সাহিবুল খারাজ উপাধিধারী অফিসারের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। আমিল ও সাহিবুল খারাজ এর মধ্যে কর্তৃত্বে তারতম্য ছিল। আমিল ছিলেন সাধারণভাবে আমিলুস সাদ্কা- যিনি সাদকা, যাকাত, স্বেচ্ছামূলক দান ও অর্থ সংগ্রহ করতেন।

কাতিব (সচিব) ঃ প্রদেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল সেক্রেটারীর (কাতিব)। দীওয়ানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে একজন ওয়ালীর উপর বহুবিধ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত। এসব দায়িত্বের কিছু কিছু তিনি কাতিব বা সেক্রেটারীর উপর ন্যস্ত করতেন। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীর কার্যাবলী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে সকল কাজ একজন ওয়ালীর পক্ষে করা সম্ভবপর ছিল না। সেই জন্য বিভিন্ন বিভাগের কাজে সহায়তার জন্য ওয়ালী কয়েকজন কাতিব নিয়োগ করতেন। কাতিবগণ ওয়ালীকে প্রশাসনিক ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। যেমন প্রাদেশিক অর্থনীতির ব্যাপারে কাতিব সকল প্রকার রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আমীর বা ওয়ালীকে সহযোগিতা করতেন।

সাহিব আল-আহদাস ঃ প্রদেশের উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন সাহিব আল-আহদাস্ বা পুলিশ প্রধান। প্রদেশ কিংবা জেলার পুলিশ অফিসারকে সাহিব আল-আহদাস বলা হতো। তিনি ছিলেন আধাসামরিক অফিসার। প্রয়োজনবোধে তাঁকে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হতো। তবে তার প্রধান দায়িত্ব ছিল নাগরিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা এবং অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করা। গ্রামের আইন

শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া থাকত গ্রাম প্রধানের উপর। অপরাধীকে ধরিয়ে দেয়া বা শায়েস্তা করার জন্য গ্রাম প্রধানের উপর চাপ প্রয়োগ করা হতো।

উমাইয়া শাসনকালে পুলিশ এত তৎপর ছিল যে, কোথাও নাগরিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারত না। মুআবিয়ার (রা) শাসনকালে ইরাকের শাসক যিয়াদ কুফায় ৪০,০০০ পুলিশ নিয়োগ করেন। তিনি বলতেন, কারো বাসায় চুরি হলে তিনি দায়ী থাকবেন। খলীফা মুআবিয়া দামেস্কের সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রস্তুত করেন ও তাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন।

কাযী বা বিচারক ঃ প্রদেশের কাযী ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কাযীকে মামলার শুনানী করা ছাড়াও কতগুলো অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হতো।

তাঁকেই অসমর্থ, নাবালক বা উন্মাদ হওয়ার কারণে যারা নিজ সম্পত্তির কর্তৃত্ব লাভে অসমর্থ তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে হতো ও তাদের সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হতো। তাকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে হতো। আইনানুগ ওসিয়ত কার্যকর করতে হতো ; অবিবাহিত মহিলাদের সম্মতি নিয়ে যোগ্যপাত্রে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করতে হতো ; আইনগতভাবে নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হতো; প্রয়োজনবোধে তাকে সদকা ও যাকাত আদায় করতে হতো; জনসাধারণের মঙ্গলের নিরাপত্তা বিধান করতে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য পথঘাট যেন কেউ দখল না করে বা গৃহাদি নির্মাণ না করে সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হতো।

ইসলামের প্রারম্ভ হতেই বিচারকের স্বাধীনতা ছিল। সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ বিচারকের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রাদেশিক ওয়ালীগণ সাধারণত কাযী নিয়োগ করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে খলীফাগণ কাযী নিয়োগ করতেন। যেভাবেই নিয়োগ হোক না কেন কাযী ন্যায়বিচার করতেন।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন

১. উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল-
ক. বাগদাদে; খ. হিযাযে;
গ. মদীনায়; ঘ. দামেস্কে।

২. উমাইয়া সাম্রাজ্য কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল?
ক. ৭টি; খ. ৪টি;
গ. ৫টি; ঘ. ৬টি।

৩. ভাইসরয় কার উপাধি ছিল?
ক. ওয়ালীর; খ. খলীফার;
গ. খলীফা কর্তৃক পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ওয়ালীর;
ঘ. জেলার কর্মকর্তার।

৪. দীওয়ান আল-মুসতাগিল্লাহ এর অর্থ হচেছ-
১. সমন্বয় সাধন দপ্তর খ. রাজস্ব দপ্তর;
গ. ভূমি দপ্তর; ৪. যোগাযোগ দপ্তর।

৫. সাহিব আল-আহদাস কার উপাধি ছিল?
ক. সামরিক প্রধানের; খ. পুলিশ প্রধানের;
গ. ডাক বিভাগীয় প্রধানের; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. উমাইয়া শাসকদের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. টিকা লিখুন-
ক. সাহিব আল-খারাজ, খ. কাতিব, গ. সাহিব আল- আহদাস, ঘ. কাযী।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. উমাইয়া শাসকদের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশদ বিবরণ দিন।

উমাইয়া সরকারের বৈশিষ্ট্য

পাঠ ঃ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- উমাইয়া সরকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- খোলাফায়ে রাশেদূনের সাথে উমাইয়া সরকার পদ্ধতির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- উমাইয়া শাসন আমলের ভাল-মন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

উমাইয়া খিলাফতের বৈশিষ্ট্য

উমাইয়া শাসনামলে তাদের রাজত্বে ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ ছিল। সকল বৈশিষ্ট্য যেমন ভাল ছিল না অনুরূপ সকল বৈশিষ্ট্য মন্দও ছিল না। নিম্নে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচিত হল-

১. উমাইয়া আমলের প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আমীর মুআবিয়া (রা) এবং মারওয়ান সাসানী ও রোমান সম্রাটদের ন্যায় নিজ নিজ পুত্রকে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মনোয়ন দান করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় উমর, হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয খোলাফায়ে রাশেদুনের মত উত্তম শাসক ছিলেন।

২. উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা হাশেমী এবং শীয়াদেরকে সকল প্রকার দায়িত্ব হতে দূরে সরিয়ে দেন।

৩. উমাইয়া শাসনকালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শাসন বিভাগ থেকে রাজস্ব বিভাগ পৃথক করা। অর্থ হাতে পেয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যাতে বিদ্রোহী হওয়ার সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশ্যে মু'য়াবিয়া (রা) রাজস্ব বিভাগকে প্রদেশের কর্তৃত্বমুক্ত করে সরাসরি কেন্দ্রের অধীন করেছেন।

৪. উমাইয়া শাসকগণ প্রকৃতপক্ষে আরব সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিলেন। সে যুগে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং কেবল আরব জাতিকেই সরকারী কার্যে নিয়োগের নীতি অবলম্বন করা হয়। উমাইয়া শাসনকে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ আরবীয় শাসন বলা যায়।

৫. উমাইয়া আমলে ধর্মকে কিছুটা রাজনীতি হতে পৃথক করে রাখা হয়। রাজনীতির জন্যই কেবল রাজনীতি করা হতো। তাই বলে তাঁরা ইসলামকে তাঁদের ধর্ম হিসেবে অস্বীকার করতেন না। শাসকবর্গ নামাযের ইমামতি করতেন বা প্রতিনিধি দ্বারা ইমামতি করিয়ে নিতেন। আর এটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম।

৬. উমাইয়া খলীফাগণ রোমানদের ন্যায় দামেস্কে জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের জীবন-যাত্রাও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।

৭. বায়তুলমালকে উমাইয়া খলীফাগণ রাজ সম্পত্তিতে পরিণত করেন এবং সেখান হতে যথেচ্ছ খরচ করতেন।

৮. আল-ফাই বা সরকারী ভূ-সম্পত্তিকে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেন। তাঁদের সম্পদ এবং সম্পত্তি এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, খলীফা হিশাম রাষ্ট্রের ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

৯. উমাইয়া শাসকবর্গ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য দেহরক্ষী নিয়োগ প্রথা চালু করেন। খলীফা আবদুল মালিক জনসাধারণকে খলীফার সামনে কথা বলতে নিষেধ করতেন।

১০. তারা জনসাধারণের বাক-স্বাধীনতা রহিত করেন এবং ধর্মীয় পন্ডিতদের সাহচর্য পরিহার করেন। কেবল রণজয়ী সেনাপতি এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমেই তাঁরা রাজ্য শাসন করতেন।

১১. উমাইয়া আমলে মাওয়ালী নীতি অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা আরব মুসলমানদের সঙ্গে সমমর্যাদা পেত না। তাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার ভীষণভাবে খর্ব করা হয় এবং অমুসলমান প্রজার ন্যায় তাদের নিকট হতে জিযিয়া ও খারাজ আদায় করা হতো।

১২. উমাইয়া আমলে সামরিক শাসনব্যবস্থা ছিল গোত্রভিত্তিক। খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী কেবল সরাসরি কেন্দ্রের অধীন ছিল। অবশিষ্ট সৈন্য গোত্রপতিদের অধীন থাকত। যুদ্ধের সময় তারা স্ব স্ব গোত্রীয় পতাকা সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত এবং প্রধান সেনাপতির ফরমান অনুসারে গোত্রপতিগণ সরকার হতে নিয়মিত অর্থ পেতেন।

১৩. উমাইয়া সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় শাসন কাজের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। বড় বড় প্রদেশের সবগুলোকেই স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা দেয়া হয়। স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা ছিল বলে প্রদেশগুলো কেন্দ্র কর্তৃক শোষিত হত না।

১৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে যেরূপ মজলিসের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাঁরা তা পরিহার করেন এবং নিজ দল ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সভাসদ নির্বাচিত করেন। যোগ্যতার প্রশ্ন তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল।

১৫. এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে উমাইয়া যুগ গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। খলীফা ওয়ালীদের আমলে বিখ্যাত সেনাপতিগণ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকা মুসলিম পতাকাতলে আনয়ন করতে সক্ষম হন।

১৬. উমাইয়া যুগে রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত ষড়যন্ত্রে খিলাফতের অনেক দাবিদার এবং যোগ্য ব্যক্তিবর্গ প্রাণ হারান।

১৭. উমাইয়া আমলে সাসানী রাজাদের দরবারের বহু কুপ্রথা দামেস্কের রাজ দরবারে প্রবেশ করে। বেশীরভাগ খলীফাই বিলাস ও প্রমোদে মত্ত থাকতেন।

১৮. উমাইয়া আমলে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দীওয়ান ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদূন ও উমাইয়া খলীফাদের শাসনকালের মধ্যে তুলনা

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইজমার উপর ভিত্তি করে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। উমাইয়া আমলে শাসন কার্যপরিচালনার ব্যাপারে খলীফাদের হুকুমের প্রাধান্য থাকত।

২. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে খলীফাগণ নিজেদেরকে জনসাধারণের সেবকমাত্র মনে করতেন। উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদেরকে শাসক হিসেবে দাবি করতেন।

৩. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে জনসাধারণের আস্থার উপর খলীফাকে নির্ভর করতে হত, কিন্তু উমাইয়া যুগে বল প্রয়োগের নীতি অনুকরণ করা হতো।

৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে খিলাফতে কোন বংশের স্থায়ী অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু উমাইয়া যুগে খিলাফতে কেবল উমাইয়াদেরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। উমাইয়া যুগে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

৬. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে জনগণের বাক-স্বাধীনতা ছিল ; কিন্তু উমাইয়া আমলে তাদের বাক-স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

৭. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে রাজকোষে খলীফার ব্যক্তিগত কোন অধিকার ছিল না। উমাইয়া আমলের খলীফাগণ রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করতেন।

৮. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে জাহেলী যুগের গোত্রীয় প্রভাব লোপ পেয়েছিল। কিন্তু উমাইয়া আমলে তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৯. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে খলীফাগণ অনাড়ম্বরপূর্ণ দরবারে বসাতেন এবং সাধারণভাবে জীবন যাপন পছন্দ করতেন কিন্তু উমাইয়া শাসকগণ আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে বসতেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন।

১০. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে ফরিয়াদীগণ সরাসরি খলীফার সামনে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করতে পারত, কিন্তু উমাইয়া আমলে সে সুযোগ ছিল না। খলীফাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়।

১১. খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে খলীফাগণ নিজেরাই আইনবিদ, শাস্ত্রবিশারদ এবং পন্ডিত ছিলেন। উমাইয়া যুগে উলামা সম্প্রদায় রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সরকারী প্রভাব হতে দূরে থেকে ইজমা ও কিয়াস এবং জ্ঞান চর্চা করতেন।

১২. খোলাফায়ে রাশেদূনের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা শরী'আত কর্তৃক সীমাবদ্ধ ছিল। উমাইয়া খলীফাগণের অনেকেই স্বৈরাচারী ছিলেন।

তবে উমাইয়া খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র) উমাইয়া আমলের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে খোলাফায়ে রাশেদূনের নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাই তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদূনের পঞ্চম খলীফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এছাড়া উমাইয়া আমলের প্রশাসনিক দক্ষতা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রশংসার দাবি দার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন

১. উমাইয়া খিলাফতের প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল-
   ক. সাম্রাজ্য বিস্তার;
   খ পরামর্শ ভিত্তিক শাসনকার্য পরিচালনা;
   গ. স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা;
   ঘ. জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

২. উমাইয়া শাসন আমলে রাষ্ট্রব্যবস্থায়-
   ক. আরব-অনারব সবার ভূমিকা ছিল সমান;
   খ. একমাত্র আরবদের প্রভাব ও ব্যাপক ভূমিকা ছিল;
   গ. হাশেমীদের গুরুত্ব ছিল;
   ঘ. উত্তর কোনটিই সঠিক নয়।

৩. কোনটি উমাইয়া আমলের বৈশিষ্ট্য-
   ক. উমাইয়া শাসকগণ আরব সভ্যতার ধারক ছিলেন;
   খ. শাসন বিভাগ থেকে রাজস্ব বিভাগকে পৃথক করেন;
   গ. রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন;
   ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৪. উমাইয়া আমলে জনসাধারণের বাকস্বাধীনতা
   ক. রহিত করা হয়নি;
   খ. স্বীয় মত প্রকাশ করার ব্যাপক সুযোগ দেয়া হয়;
   গ. রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে তাদের কথা বলার অধিকার ছিল;
   ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. উমাইয়া আমলের উল্লেখযোগ্য ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২. ''উমাইয়া আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'' ব্যাখ্যা করুন।
৩. খোলাফায়ে রাশেদূনের সঙ্গে উমাইয়া সরকার পদ্ধতির ৫টি পার্থক্য উল্লেখ করুন।
৪. উমাইয়া শাসনকে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ-আরবীয় শাসন বলা যায়-বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. উমাইয়া আমলের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. খোলাফায়ে রাশেদূন ও উমাইয়া শাসনকালের মধ্যে তুলনা করুন।

পাঠ ঃ ৪ আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

◆ আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

◆ আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থায় উযীর এবং হাজিব এর দায়িত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

◆ আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

আব্বাসীয়দের সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের শাসনকাল মুসলিম শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। আব্বাসীয় যুগে উমাইয়া যুগের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। উমাইয়া যুগ ছিল প্রধানত যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারের যুগ। কিন্তু আব্বাসীয় যুগছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির যুগ, এ যুগ মুসলিম মননশীলতা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশের যুগ। এ যুগে মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিটি শাখায়, বিশেষ করে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থায়, অধিকতর সংগঠন ও দক্ষতা অর্জিত হয়। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের শাসনব্যবস্থায় শুধু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনই করেননি, বরঞ্চ তারা এতে অনেক মৌলিক নীতিরও সংযোজন করেন।

উমাইয়া আমলের ন্যায় আব্বাসীয় আমলেও রাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উমাইয়া খলীফাদের মত আব্বাসীয় খলীফাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন। তাঁরাও রাজদরবার প্রবর্তন করেন। তবে আব্বাসীয়রা প্রাচীন পারস্যের সাসানীয় নরপতিদের অনুকরণে রাজদরবারের জাঁকজমক বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। ফলে আব্বাসীয় রাজশক্তির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও ভীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাজদরবারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন এবং অসংখ্য সরকারী কর্মচারী, সভাসদ, অনুচরবর্গ, ভৃত্য ও দেহরক্ষী বাহিনী পরিবেষ্টিত ছিল। ফলে জনসাধারণ ও বিদেশ হতে আগত রাষ্ট্রদূতদের মনে খলীফার শক্তি ও প্রতাপ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হতো।

খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ উমাইয়া শাসনকালের মত আব্বাসীয় শাসনামলেও খলীফা ছিলেন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। খলীফা ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে সকল গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নিষেধ তিনিই জারি করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। খলীফার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে-সামরিক ও বেসামরিক। আব্বাসীয় শাসনামলে উযীর এবং হাজীব ছিলেন খলীফার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

আব্বাসীয় উযীর ঃ রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় খলীফার পর ছিল উযীরদের স্থান। উযীর ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় খলীফার প্রধান সাহায্যকারী ; তিনি ছিলেন খলীফার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় বেসামরিক শাসন ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি খলীফাকে রাষ্ট্রের সমুদয় প্রশাসনিক কার্যাবলীতে সাহায্য করতেন। খলীফাকে শাসন ব্যাপারে উপদেশ দেয়া, খলীফার আদেশ নির্দেশ কার্যকর করা এবং খলীফার পক্ষে রাষ্ট্রের গোটা শাসনব্যবস্থার তদারক করা ছিল উযীরের অন্যতম কর্তব্য।

হাজিব ও তার দায়িত্ব

খলীফা ও উযীরদের পর রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় হাজিব ছিলেন তৃতীয় প্রধান কর্মকর্তা। আব্বাসীয় শাসনের প্রথমদিকে উযীর ও হাজিব নামক দুই'জন পৃথক কর্মকর্তা ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত ঐ সময় উযীরই হাজিবের দায়িত্ব পালন করতেন এবং পরবর্তীকালে উযীরের কার্যাবলী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাজিবের পদ সৃষ্টি হয়। মুসলিম শাসনব্যবস্থায় উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকই প্রথম হাজিবের পদ প্রবর্তন করেন। বিশাল রাষ্ট্রের অসংখ্য অত্যাচারিত জনগণ তাদের অভিযোগের প্রতিকারার্থে স্বভাবতঃই খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করত। কিন্তু খলীফার পক্ষে সব সময় জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। খলীফার পক্ষে হাজিবই জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। অনেক অভিযোগ হাজিব নিজেই পূরণ করে দিতেন। কিন্তু যাদের অভিযোগ পূরণ করা হাজিবের পক্ষে সম্ভব হত না তিনি কেবল তাদেরকেই খলীফার নিকট উপস্থিত করতেন। জনগণকে খলীফার নিকট উপস্থিত করাই ছিল হাজিবের প্রধান কর্তব্য। বিদেশ হতে আগত রাষ্ট্রদূতদেরকেও হাজিব

খলীফার সম্মুখে উপস্থিত ও পরিচয় করিয়ে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে হাজিব ছিলেন খলীফার ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি সব সময় খলীফার সঙ্গে থাকতেন। খলীফার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলেই হাজিবের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রীয় প্রশাসন

আব্বাসীয় শাসন আমলে কেন্দ্রীয় সরকরের প্রশাসনিক কার্যাবলী প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রশাসনিক বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।

দীওয়ান আল-জুন্দ (সামরিক বিভাগ) ঃ উমাইয় যুগের মত এ যুগেও কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ দীওয়ান আল-জুনদ নামে অভিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং যাবতীয় সামরিক চাহিদা পূরণ কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। সামরিক বিভাগ প্রধানতঃ সামরিক বিভাগের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করত। এ বিভাগের মজলিস আল-মুকাবাহ শাখা সৈন্য নিয়োগ, মজলিস আল-তাকবীর শাখা সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং আল-আরয শাখা অস্ত্রাগারে সামরিক সাজ সরঞ্জাম পরীক্ষা করতো।

দীওয়ান আল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) ঃ এ বিভাগ রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। রাজস্বনীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ধার্য ও আদায় করা, রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় বহন যথা সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং সরকারের সমুদয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল।

দীওয়ান আল-বারীদ (ডাক বিভাগ) ঃ মহানবী (স) এবং ধর্মপ্রাণ চার খলীফার আমলে ডাক ব্যবস্থা চালু ছিল না। তাঁদের আমলে রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পত্রবাহক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু উমাইয়া যুগে খলীফা মুআবিয়া (রা) সাসানীয় শাসনের অনুকরণে মুসলিম শাসনব্যবস্থায় প্রথম ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং ডাক ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য দীওয়ান আল-বারীদ নামে রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয় শাসনকালে ডাক ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির মূলে ডাক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর আব্বাসীয় খলীফাগণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে খবরাখবর আদান প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করণ এবং প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করা ছিল ডাক বিভাগের প্রদান কর্তব্য। এ বিভাগে নিয়োগ সকল কর্মচারী রাষ্ট্রীয় খবরাখবর সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতায় নিয়োগ ছিল। অতএব ডাকবিভাগকে এক সঙ্গে রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগের দায়িত্বও পালন করতে হতো।

রাষ্ট্রের গোটা ডাক ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের ভার কেন্দ্রীয় সাহিব আল-বারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি প্রাদেশিক বারীদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন, প্রদেশের বিভিন্ন শহরে ডাক কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন, সাম্রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের ডাক ষ্টেশনে উপযুক্ত ডাক কর্মচারী ও ডাক বাহক মোতায়েন করতেন এবং তাদের বেতন ও রসদ সরবরাহের তত্ত্বাবধান করতেন। সাহিব আল বারীদ তার প্রাদেশিক সহকারীদের নিকট হতে প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে প্রাপ্ত খবর হুবহু এবং কোন কোন সময় তাদের খবরের উপর ভিত্তি করে তারা নিজস্ব রিপোর্ট প্রয়োজন অনুসারে খলীফা এবং প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের নিকট প্রেরণ করতেন। অনেক সময় প্রাদেশিক ডাক প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ খবরের অংশ বিশেষ কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগে সংরক্ষিত রাখা হতো।

ডাক ব্যবস্থার প্রধান সাহিব আল-বারীদ রাষ্ট্রের গোয়েন্দা ব্যবস্থারও প্রধান ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোয়েন্দা তৎপরতায় ডাক বিভাগের সকল কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। ডাক প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে সাহিব আল-বারীদের পূর্ণাঙ্গ উপাধি ছিল সাহিব আল-বারীদ ওয়াল-আখবার।

দীওয়ান আল-রাসায়িল (পত্র লিখন বিভাগ) ঃ মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সরকারী চিঠি-পত্র লিখার ভার ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু উমাইয়া যুগে এ দায়িত্ব পালনের জন্য দীওয়ান আল-রাসায়িল নামে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র লিখন বিভাগ স্থাপিত হয়। খলীফা মুআবিয়া (রা) এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আব্বাসীয় যুগে দীওয়ান আল-রাসায়িল রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দফতর হিসেবে

গণ্য ছিল। সরকারী চিঠি-পত্র এ বিভাগেই লিখিত হত এবং লিখিত চিঠিপত্র ও ফরমান খলীফা কিংবা উযীরের অনুমোদনের পর এ বিভাগে যথারীতি সীলমোহর করা হতো।

দীওয়ান আল-খাতাম (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ) ঃ সরকারী চিঠিপত্র ও আদেশ নির্দেশে জালিয়াতির সম্ভাবনা দূর করার জন্য উমাইয়া খলীফা মুআবিয়া রাষ্ট্রীয় রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও দলিলের অনুলিপি রাখা হতো এবং মূলকপি সীলমোহর করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হতো। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগে (খলীফা আল-আমীনের খিলাফত পর্যন্ত) রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ বলবৎ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ বিভাগের কার্যাবলী দীওয়ান আল-তাওকী নামে সরকারের অন্য এক বিভাগ পালন করতো।

দীওয়ান আল-তাওকী (অনুরোধ বিভাগ) ঃ খলীফার নিকট জনগণের লিখিত আবেদন পত্রের উপর খলীফার সিদ্ধান্ত ও মতামত তাওকী নামে অভিহিতো আবেদন পত্রের উপর খলীফা নিজে কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে সিদ্ধান্ত লিখতেন। কেন্দ্রীয় অনুরোধ বিভাগ খলীফার এসব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিক আদেশনামা তৈরী এবং অনুলিপি রাখার পর আদেশনামা সীল মোহরকৃত অবস্থায় নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করাহতো।

দীওয়ান আল-আযিম্মা (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ) ঃ খলীফা আল-মাহদী সরকারের আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধীয় প্রশসনিক বিভাগসমূহের দূর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত বিভাগসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হিসাব নিরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে দীওয়ান আল-আযিম্মা এবং প্রাদেশিক সরকারে দীওয়ান আল-যিমাম নামক হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা হয়। হিসাব নিরীক্ষণের সুবিধার্থে দীওয়ান আল-আযিম্মা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগসমূহের (দীওয়ান আল-খারাজ, দীওয়ান আল-দিয়ার, দীওয়ান আল-সাওয়াফি এবং দীওয়ান আল-নাফাকাত প্রভৃতি) জন্য পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ ও পৃথক হিসাব রেজিষ্টার (যিমাম) রক্ষা করতো। প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগও প্রাদেশিক সরকারের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এ বিভাগের প্রধানের উপাধি ছিল সাহিব দীওয়ান আল-আযিম্মা। তার সহকারীকে নায়েব দীওয়ান আল-আযিম্মা বলা হতো।

দীওয়ান আল-দীয়ার (খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) ঃ খলীফা আবু বকর ও উমর (রা) অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। অতি নগণ্য রাষ্ট্রীয় ভাতায় তাঁরা নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে খলীফাদের ধন-সম্পদ লাভের প্রবণতা দেখা দেয়। আব্বাসীয় যুগে সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই খলীফাগণ ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার দীওয়ান আল-দিয়ার এর উপর ন্যস্ত ছিল।

দীওয়ান আল-নাফাকাত (রাজকীয় পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ) ঃ রাজ দরবার ও রাজপ্রাসাদ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এ বিভাগ হতেই বহন করা হতো। রাজ দরবার ও রাজপ্রাসাদে নিয়োগ কর্মচারীদের বেতন, রসদ বন্টন, রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ ও মেরামত এবং রাজ আস্তাবলের তত্ত্বাবধান এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। আব্বাসীয় যুগে রাজকীয় জাঁকজমক বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এ যুগে রাজপ্রাসাদে ও রাজ দরবারে নিয়োগ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল অনেক। খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী, খলীফার ব্যক্তিগত কর্মসচিব, রাজকীয় কুর'আন পাঠক, রাজকীয় জ্যোতিষ, হাস্য রসিক, পাঠক, চিকিৎসক প্রভৃতি দরবারে নিয়োগ কর্মচারীর মধ্যে অন্যতম। রাজদরবার ও রাজ প্রাসাদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হতো। একমাত্র রাজকীয় রন্ধনশালা ও রুটী তৈরী কারখানার জন্য মাসে ১০,০০০ দীনার বরাদ্দ থাকতো।

দীওয়ান আল-সাওয়াফী (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ) ঃ মুসলিম বিজয়ের সময় প্রাক্তন রাজবংশ ও অভিজাত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জমি, পারস্যের সাসানীয় শাসনাধীন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অগ্নিমন্দিরের জন্য উৎসর্গকৃত জমি এবং ডাক বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত জমি মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। এ সব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ দীওয়ান আল-মাওয়াফীর উপর ন্যস্ত ছিল।

দীওয়ান আল-নযর ফিল্-মাযালিম (অভিযোগ পর্যালোচনা বিভাগ) ঃ সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, জনগণের উপর অত্যাচার-অবিচার, তহবিল তসরুফ প্রভৃতি অসদাচরণের তদন্ত ও প্রতিকার এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য ছিল। অন্যায়ভাবে জনগণের অধিকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভাতা কমিয়ে বা বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ, মুহতাসিবের আদেশ নির্দেশ কার্যকর করতে তাকে সাহায্য প্রদান, কাযীর রায় আইন সম্মত না হলে সে ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ ও পুনঃবিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। দীওয়ান আল-মাযালিম ছিল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারী আপিল আদালত। খলীফা নিজে কিংবা উযীর, কিংবা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি কিংবা খলীফা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মাযালিম বিভাগে সভাপতিত্ব করতেন।

দীওয়ান আল-কাযা (বিচার বিভাগ) ঃ বিচার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে এবং সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে ও শহরে কাযী নিয়োগ ছিলেন। কাযীরা ছিলেন বিচার কার্যে খলীফার প্রতিনিধি। কারণ খলীফা রাষ্ট্রীয় বিচারের উৎস এবং সর্বোচ্চ প্রধান বিচারক। তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা মাহদী মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রথম প্রধান বিচারক ছিলেন। তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা মাহদী মুসিলম শাসনব্যবস্থার প্রথম প্রধান বিচারপতির (কাজী আল-কুযাত) পদ সৃষ্টি করেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন। আবু ইউসুফ খলীফা মাহদী, হাদী ও হারুন অর-রশীদের শাসনকালে কাযী উল-কুযাত পদে আসীন ছিলেন। কাযী উল-কুযাত রাষ্ট্রের বিচার ও ধর্মীয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করতেন।

পুলিশ বিভাগ

আব্বাসীয় যুগে পুলিশ সংগঠন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ যুগে পুলিশ বাহিনী নিম্নলিখিত চারটি বিশেষ শাখায় সংগটিত ছিল।

- শূরতা (সাধারণ পুলিশ বাহিনী) এর প্রধান সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত ছিলেন।
- মা'উনা (সামরিক পুলিশ বাহিনী) এর প্রধানের উপাধি ছিল সাহিব আল-মা'উনা।
- হারাস্ (প্রহরী পুলিশ বাহিনী) এ বাহিনীর প্রধান সাহিব আল-হারাস নামে অভিহিত ছিলেন।
- আহদাস্ (বিশেষ পুলিশ বাহিনী) এর প্রধানের উপাধি ছিল সাহিব আল-আহদাস।

দীওয়ান আল-হিসবাহ ঃ এটি পুলিশ বিভাগের মত এক প্রকারের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ। নাগরিক জীবনে সর্ব প্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট ছিল না। তাই তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদী দীওয়ান আল-হিসবাহ নামে এ বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ স্থাপন করেন। আইন শৃঙ্খলার অগ্রগতি সাধন এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য ছিল।

অন্যান্য দপ্তর

উপরোক্ত প্রশাসনিক বিভাগগুলো ব্যতীত আব্বাসীয় যুগে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আরও অনেক ছোটখাট প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলোর মধ্যে দেয়ান আল-আকরিয়া (কৃষি বিভাগ), দীওয়ান আল-মুকাতিয়াত্ (সরকারী সাহায্য বিভাগ), দীওয়ান আল-মুসাদেরীন (সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বিভাগ), দীওয়ান আল-মাওয়ালী ওয়াল-গীলমান (দাসদাসী ও আশ্রিতদের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন

১. আব্বাসীয় শাসনকাল কত বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

ক. পাঁচ বছর; খ. পাঁচশত পঁচিশ বছর;
গ. চারশত পঞ্চাশ বছর; ঘ. প্রায় পাঁচশত বছর।

২. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে খলীফার কার্যাবলী কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

ক. তিন ভাগে; খ. ছয় ভাগে;
গ. দুই ভাগে; ঘ. চার ভাগে।

৩. আব্বাসীয় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রধানতঃ কয়টি দীওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল?

ক. ২০টি; খ. ২১টি;
গ. ১৪টি; ঘ. ১২টি।

৪. দীওয়ান আল দিয়ার-এর দায়িত্ব ছিল-

ক. রাজস্ব আদায় করা; খ. রাজস্ব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন করা;
গ. খলীফার ব্যক্তিগত সম্পদ তদারকী করা; ঘ. রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
২. আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থায় উযীর ও হাযিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ছিল?
৩. আব্বাসীয় আমলে ডাক বিভাগের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. দীওয়ান আল-আযিম্মা ও দীওয়ান আল নাফকাত সম্পর্কে টীকা লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনা করুন।

আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি

পাঠ ঃ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আব্বাসীয় আমলে আমীর বা প্রদেশের গভর্নরদের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন;
- প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রদেশঃ শাসন কাজের সুবিধার্থে উমাইয়া যুগের মত আব্বাসীয় যুগেও সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট অর্থাৎ প্রদেশে ভাগ করা হয়। সাম্রাজ্য ভাগ করণের ব্যাপারে উমাইয়া এবং আব্বাসীয়রা প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী বাইজেন্টিয় এবং সাসানীয় প্রদেশগুলোর ভৌগলিক সীমারেখাকে অনেকাংশেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্য ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি না হলেও প্রদেশের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। আব্বাসীয় যুগে উমাইয়াদের প্রায় প্রতিটি বৃহদাকার এবং সম্পদশালী প্রদেশকে শাসনের সুবিধার্থে একাধিক প্রদেশে ভাগ করা হয়। ইবনে খালদুনের মতে হারুন-অর-রশীদ এবং মামুনের খিলাফত কালে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ৩৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রফেসর হিট্টি অবশ্য ঐ সময়ে সাম্রাজ্যের ২৪টি প্রধান প্রদেশের কথা উল্লেখ করেন। ইবনে খালদুন বর্ণিত ৩৬টি প্রদেশ নিম্নরূপ ঃ– (১) আস-সাওয়াদ (২) কাসকার (৩) দিজ্‌লা (৪) হালওয়ান (৫) আল-আহওয়ায্ (৬) ফারস্ (৭) কিরমান (৮) মুকরান (৯) সিন্দ্ (১০) সিজিস্তান (১১) খোরাসান (১২) গুরগান (১৩) কুর্মিস (১৪) তাবারিস্থান (১৫) আর-রাই (১৬) ইস্পাহান (১৭) হামাদান (১৮) বসরা ও কুফা (১৯) সাহারজুর (২০) মোসুল (২১) আল-জাযিরাহ (২২) আযারবাইহান (২৩) মুকান ও কার্ক (২৪) জিলান (২৫) আর্মেনীয়া (২৬) কিনাসিরিন ও আওয়াসীম (২৭) হিম্‌স (২৮) দামেস্ক (২৯) জর্দান (৩০) ফিলিস্তিন (৩১) মিসর (৩২) বারকা (৩৩) ইফ্রিকিয়া (৩৪) ইয়ামেন (৩৫) মক্কা ও মদিনা (৩৬) মাসাবাদন।

আয়তনের দিক দিয়ে আব্বাসীয় প্রদেশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য খুবই কম। কোন কোন প্রদেশ খুবই বড় এবং কোনটি আবার খুবই ছোট। ছোট প্রদেশগুলো প্রধানত রাজস্ব ইউনিট হিসেবে গণ্য ছিল এবং এগুলোতে পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বৃহদাকার ও গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহে পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কোন কোন সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তার যোগ্যতা অনুসারে প্রদেশের সীমারেখা নির্ধারণ করা হতো কম দক্ষ ও কম ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে একটি বৃহৎ প্রদেশকে একাধিক ছোট প্রদেশে ভাগ করা হতো আবার খলীফা কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে একাধিক প্রদেশের শাসনভারও ন্যস্ত করা হতো।

উমাইয়া যুগের মত আব্বাসীয় যুগেও সাম্রাজ্যকে আল-মাগরেব (পশ্চিমাঞ্চল) এবং আল-মাশরেক (পূর্বাঞ্চল)-এ ভাগ করার রীতি প্রচলিত ছিল। খলীফা হারুন-অর-রশীদ জাফর বার্মাকীকে আল-মাগরেব অর্থাৎ আল-আনবর হতে সাম্রাজ্যের সমুদয় পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের এবং জাফরের ভ্রাতা ফযল বার্মাকীকে আল-মাশরেক অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সমূদয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। বার্মাকী বংশের পতনের পর হারুন-অর-রশীদ ফযল ইবনে সাহলকে একই সময়ে খুরাসান, কুরগান, তাবারিস্তান ও আর রাই, এ চারটি প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে খলীফা মামুন ফযল ইবনে-সহলকে সাম্রাজ্যের সমুদয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং তাকে যুররিয়াস্াতায়িন উপাধিতে ভূষিত করেন। এ উপাধির অর্থ-তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক এ উভয় ক্ষেত্রেরই প্রধান।

আমীর নিয়োগঃ উযীরের পরামর্শক্রমে খলীফা আমীর নিয়োগ করতেন। খলীফার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, খলীফার প্রতি বিশেষভাবে অনুগত ব্যক্তি কিংবা খিলাফতের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিখ্যাত কোন ব্যক্তিকেই আমীর নিয়োগ করা হতো। বস্তুত রাজনৈতিক কারণ এবং খলীফার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন আমীর পদে নিয়োগের স্বাভাবিক দাবিদার হিসেবে বিবেচিত হতো। রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় আন্দোলনে নেতৃত্বদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খলীফা আস-স্াফফাহ্ আবু মুসলিম খোরাসানীকে খোরাসানের এবং আবু আইয়নকে মিসরের আমীর নিয়োগ করেন। খলীফা মামুন তাঁর ভ্রাতা আমীনের বিরুদ্ধে খোরাসানের অধিবাসীদের সক্রিয় সমর্থনের জন্য সে প্রদেশের আমীর কিংবা অন্য কোন সরকারী পদে খোরাসানীদের দাবির অগ্রাধিকার দিতেন। হারুন-অর-রশীদ পুত্র মামুনকে খোরাসানের এবং খলীফা মুতামিদ

৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তার দু'পুত্র জাফর এবং আবু আহমেদকে যথাক্রমে সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের আমীর নিয়োগ করেন। যখন কোন যুবরাজকে আমীর নিয়োগ করা হত তখন তার উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী হিসেবে একজন উচ্চ পদাধিকারী সামরিক অধিনায়ককে তার সাথে সংযুক্ত করা হতো।

প্রাদেশিক আমীরের দায়িত্বঃ আব্বাসীয় যুগেও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ঘনিষ্ট অনুকরণে গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় যে সব প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায়ও যথাসম্ভব সেগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রশাসনিক দফতরের কার্যভার প্রাদেশিক সরকারের একটি মাত্র প্রশাসনিক দফতরের উপরও ন্যস্ত করা হতো সর্বোপরি, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার প্রধান আমীরের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী অনেকাংশেই ছিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান খলীফার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলীর অনুরূপ। আমীর ছিলেন প্রকৃত পক্ষে প্রদেশে খলীফার প্রতিনিধি। তিনি কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যোগসূত্রস্থাপনকারী।

আমীর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। তিনি প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্র বিন্দু। তিনি একই সঙ্গে প্রদেশের সামরিক ও বেসামিরিক শাসনের প্রধান। প্রদেশে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনারও দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, প্রদেশের অন্য কর্মচারীদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, বিধর্মী ও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রদেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা করা এবং নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় নিরাপত্তা বিধান আমীরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গণ্য ছিল।

আমীরের ক্ষমতা ও পদচ্যুতিঃ আমীরকে সামরিক এবং শাসন ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতার অধিকারী হতে হতো আমীর খলীফা, কিংবা উযীরের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা এবং অসৎ উপায়ে ধন সম্পদ অর্জনের মত গুরুতর অপরাধের অভিযোগে আমীর খলীফা, অথবা উযীর কর্তৃক পদচ্যুত হতেন। পদচ্যুত আমীরের সম্পত্তিও প্রায়ই বাজেয়াপ্ত করা হতো রাষ্ট্রীয় শাসনে অত্যন্ত তৎপর এবং মনোযোগী খলীফা উযীরের সুপারিশ ব্যতীত নিজেই আমীর নিয়োগ করতেন এবং আমীরের পদচ্যুতিও সম্পূর্ণরূপে তার খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করত। আব্বাসীয় শাসনের প্রারম্ভিক যুগে বিশেষ করে খলীফা মনসুরের আমলে আমীর নিয়োগ, বদলী ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে খলীফার ইচ্ছাধীন ছিল। মনসুর অসদুপায়ে ধনসম্পদ অর্জনের অভিযোগে পদচ্যুত আমীরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। এভাবে বাজেয়াপ্তকৃত ধনসম্পদ জমা রাখার জন্য তিনি বায়তুল মাল আল-মাযালিম (অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদের কোষাগার) নামে বিশেষ রাষ্ট্রীয় কোষাগার স্থাপন করেন।

প্রাদেশিক আমীরদের প্রকারভেদ ও তাঁদের ক্ষমতা

আল-মাওয়ার্দী আব্বাসীয় শাসন আমলে প্রাদেশিক আমীরদের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে তাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা– অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমীর, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমীর এবং জোর পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী প্রাদেশিক স্বাধীন আমীর।

খলীফার কোন বিশেষ প্রিয়ভাজন ব্যক্তিকে কোন কোন সময় অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে প্রাদেশিক আমীর নিয়োগ করা হতো তবে সাধারণত দুর্বল ও অযোগ্য খলীফা কিংবা শাসন ব্যাপারে অমনোযোগী খলীফার আমলে প্রাদেশিক আমীরগণ অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমীর প্রদেশ শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রদেশের সামরিক, বেসামরিক, রাজস্ব, বিচার ও ধর্মীয় শাসনের প্রধান। তিনি প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী পরিচালনায় সর্বময় দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ ও বিচারকদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পুলিশ বাহিনী নিয়োগ এবং পুলিশের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। কোন নতুন মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা, শুক্রবারের জুমুআর নামায এবং বাৎসরিক ঈদের নামায পরিচালনা এবং প্রতি বছর পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনাতে হজ্জ কাফেলা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ আমীরের ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল। কোন কোন সময় আমীর নিজে আবার কোন কোন সময় তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তি হজ্জ কাফেলার নেতৃত্ব দিতেন। বেদুঈন আক্রমণ হতে হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তার জন্য হজ্জ কাফেলার অধিনায়ক (আমীর আল-হজ্জ) প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী আমীরের

কার্যাবলীতে কেন্দ্রীয় সরকার খুব কমই হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁকে ঘন ঘন বদলী করা হতো না। অনেক সময় তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকতেন।

অত্যন্ত দক্ষ এবং শাসনকার্যে খুবই মনোযোগী খলীফার আমলে প্রাদেশিক আমীরগণ সীমিত ক্ষমতা ভোগ করতেন। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমীরের কার্যাবলীতে কেন্দ্রীয় সরকার অহরহ হস্তক্ষেপ করতেন। তাদেরকে ঘন ঘন এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে বদলী করা হতো এবং সামান্য অপরাধের অজুহাতে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রাদেশিক আমীর প্রাদেশিক রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থায় কোন কর্তৃত্ব করতে পারতেন না।

আব্বাসীয় শাসনকালে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশের প্রাদেশিক আমীরগণ সুযোগ পেলেই খলীফার ক্ষমতা উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতো। সে যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ এবং অন্যান্য কারণে খলীফার পক্ষে অনেক সময় এ সব জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী প্রাদেশিক আমীরগণকে দমন করা সম্ভব হত না। ফলে তাঁরা প্রদেশে স্থায়ীভাবে স্বাধীন বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতেন। খলীফা মামুনের শাসনকালে আব্বাসীয় সামরিক শক্তি যখন অক্ষুণ্ন ছিল তখনও ইয়ামেনের আমীর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ইয়ামেনের এবং খোরাসানের আমীর তাহির ইবনে-হুসেন খোরাসানে স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে আব্বাসীয় খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাদেশিক আমীরদের স্বাধীনতা স্পৃহা খুবই প্রবল হয়ে উঠে। ফলে বহু স্বাধীন আমীরাতের উৎপত্তি হয়। এ সব জোর পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্বাধীন আমীরগণ যদিও প্রকৃত পক্ষে ছিলেন স্বাধীন নরপতি তবু নিজেদের স্বার্থে তারা খিলাফতের সাথে নাম মাত্র সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তারা খলীফাকে মুসলিম জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান হিসেবে সম্মান দেখাতেন। শুক্রবারের নামাযের খুতবায় তাদের নিজের নামের সাথে খলীফার নাম পাঠ করতেন এবং খলীফাকে নামমাত্র বাৎসরিক কর প্রেরণ করতেন। আর দুর্বল খলীফাগণ তাদের শক্তিশালী স্বাধীন আমীরদের এ আনুগত্য প্রদর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে তাদের ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করতেন এবং বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতেন।

জোর পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্বাধীন আমীরকে প্রাদেশিক আমীর না বলে খিলাফতের আওতাধীন স্বাধীন মুসলিম নরপতি বলাই যুক্তিযুক্ত। অসীম ক্ষমতার প্রাদেশিক আমীর এবং সীমিত ক্ষমতার প্রাদেশিক আমীরের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপারে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা ছিলেন প্রত্যেকে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ কোন আমীরের পক্ষে একা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব কতিপয় প্রশাসনিক বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। আব্বাসীয় শাসনকালে প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে নিম্নলিখিত নয়টি প্রশাসনিক দফতর কার্যকর ছিল। বলাবাহুল্য প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিভাগগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের শাখা স্বরূপ ছিল। প্রাদেশিক দপ্তরগুলো নিম্নরূপ-

দীওয়ান আল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) ঃ প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায়, রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ এবং প্রাদেশিক সরকারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এ বিভাগ হতেই প্রাদেশিক সৈন্য বাহিনী ও প্রাদেশিক সরকারে নিয়োগ সকল কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা বন্টন করা হতো সরকারের সমুদয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজেও এই বিভাগ হতে অর্থ ব্যয় করা হতো সরকারের সমুদয় ব্যয় নির্বাহের পর প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হতো প্রাদেশিক রাজস্ব যদি প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট না হত তা হলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের নিকট হতে অর্থ প্রেরণ করা হতো প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসেবে তা গ্রহণ করত।

রাজস্ব বিভাগের প্রধান (আমিল) ঃ প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের প্রধান (আমিল) প্রাদেশিক আমীরের পর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। আমিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ হতেন এবং তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের নিকট প্রধানত দায়ী থাকতেন। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী আমীর প্রাদেশিক আমিলের কার্যাবলীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। তবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী আমীর আমিলসহ প্রদেশের সকল কর্মকর্তার কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করতেন। কোন কোন সময় আমিল প্রদেশের নিয়মিত বেতন ভোগী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ হতেন না। তিনি প্রদেশের রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা আদায় করে দিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে অথবা কোষাগারে জমা দিয়ে প্রাদেশিক আমিল নিয়োগ হতেন। এভাবে

চুক্তির মাধ্যমে আমিল নিয়োগ হলে প্রাদেশিক রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অরাজকতা দেখা দিত। আমিল নির্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশী রাজস্ব বলপ্রয়োগে জনসাধারণের নিকট হতে আদায় করে আত্মসাৎ করতেন।

কোন কোন সময় কোন বিশেষ প্রদেশে আমিল নামে কোন রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ হতেন না। প্রাদেশিক আমীর একই সঙ্গে প্রাদেশিক রাজস্ব ও যাবতীয় শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে আমীর ও আমিল নিজেদের মধ্যে যোগসাজসে প্রদেশে নিজেদের ইচ্ছামত শাসন পরিচালনা করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাদেশিক রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে দিতেন। ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কিরমান ও ফারসের আমীর ও আমিল একতাবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাদেশিক রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে দেয়।

দীওয়ান আল-বারীদ (ডাক বিভাগ) ঃ প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাদেশিক ডাক বিভাগ এবং প্রদেশের প্রত্যেক শহরে এর শাখা অফিস ছিল। প্রাদেশিক ডাক বিভাগের প্রধান কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের প্রধানের মত সাহিব আল-বারীদ নামে অভিহিত ছিলেন। প্রাদেশিক ডাক প্রধান ছিলেন প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও অনুচর। তিনি প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করতেন এবং প্রাদেশিক আমীরসহ প্রদেশের সকল কর্মচারীর আচরণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের নিকট অথবা সরাসরি খলীফার নিকট গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করতেন। ৮২২ খ্রীষ্টাব্দে খলীফা মামুনের শাসনকালে খোরাসানের আমীর তাহের ইবন-হুসেন যখন শুক্রবারের নামাযের খুতবায় খলীফার নাম বাদ দিয়ে নিজ নাম প্রবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন খোরাসানের সাহিব আল-বারীদ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের নিকট মাঝে মাঝে প্রদেশের সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করতেন। আরও যে সব বিষয় কেন্দ্রকে অবহিত করা হত তা হল প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অগ্রগতি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মনোভাব, প্রদেশে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা, বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান, রাজস্ব আদায়কারীদের আদায়কৃত অর্থ, মুদ্রণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে স্থান পেত। সাহিব আল-বারীদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের অংশ বিশেষ কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগে সংরক্ষিত রাখা হতো।

ডাক চলাচলের জন্য সাম্রাজ্যের সকল রাস্তার পার্শ্বে মাইল-চিহ্ন এবং ডাকঘর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক ডাকঘরেই ডাক বহনের জন্য ঘোড়া, গাধা, উট ও খচ্চর মোতায়েন রাখা হতো সাধারণ ঘোড়া হতে ডাক বিভাগের ঘোড়াকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য ডাক- ঘোড়ার লেজ বিশেষভাবে ছাটা হতো। জরুরি অবস্থায় গোপণীয় খবর দ্রুত আদানপ্রদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবুতর ব্যবহার করা হতো।

উত্তর আফ্রিকায় গ্রীক ও রোমান রীতি অনুসারে অগ্নি সঙ্কেতের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশেষ করে শত্রু আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করা হতো। পাহাড়ের উপর অগ্নি প্রজ্বলনের মাধ্যমে অগ্নি সংকেত প্রদান করা হতো।

উমাইয়া যুগের মত আব্বাসীয় যুগেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ডাক ব্যবস্থায় বিপুল পরিমান রাজস্ব ব্যয় হতো উমাইয়া খলীফা হিশামের শাসনকালে একমাত্র ইরাক প্রদেশে ডাক বিভাগের বার্ষিক খরচ ছিল প্রতিদিন চার লক্ষ দিরহাম। আব্বাসীয় যুগে খলীফা মুক্তাদিরের শাসনামলে উক্ত প্রদেশের ডাক বিভাগের বার্ষিক খরচ ছিল এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দীনার। ডাক-ঘোড়া পোষণ, নতুন ঘোড়া ক্রয়, ডাক কর্মচারী ও ডাক বহনকারীর বেতন প্রদান এবং ডাক বিভাগের যাবতীয় চাহিদা পূরণ এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দীওয়ান আল-জুন্দ (সামরিক বিভাগ) ঃ প্রাদেশিক সরকারের সৈন্য নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বন্টন, প্রাদেশিক সামরিক বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক সামরিক বিভাগের রীতিনীতি কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের রীতিনীতির অনুরূপ ছিল। সামরিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে যথা সৈন্যদের বেতন বাড়ানো ও কমানোর ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। খলীফাই এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিলেন। তবে দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোন মারাত্মক পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক আমীর খলীফার অনুমতি ব্যতীত অস্থায়ী ভিত্তিতে সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি করতে পারতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় যুগে সাম্রাজ্যকে কয়টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়?

ক. ১৪টি; খ. ২৪টি;
গ. ৩৪টি; ঘ. ৯টি ।

২. আমীর ছিলেন-

ক. কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান; খ. প্রাদেশিক সরকার প্রধান;
গ. আঞ্চলিক সরকার প্রধান; ঘ. ধর্মীয় বিভাগের প্রধান।

৩. বাজেয়াপ্তকৃত ধনসম্পদ যে কোষাগারে জমা রাখা হত তার নাম ছিল-

ক. বায়তুলমাল; খ. বায়তুলমাল আল-মাযাালিম;
গ. বায়তুল খাযানা; ঘ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার।

৪. দীওয়ান আল-খারায বলা হয়-

ক. রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে; খ. রাজস্ব বিভাগাকে;
গ. সামরিক বিভাগকে; ঘ. সৈন্য বিভাগকে।

৫. আব্বাসীয় যুগে আমিল কে ছিলেন?

ক. রাজ কর্মচারী; খ. কোষাগার সংরক্ষণকারী;
গ. প্রাদেশিক সরকারের ২য় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; ঘ. প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের প্রধান।

৬. আব্বাসীয় যুগে ডাক বিভাগকে বলা হত-

ক. দীওয়ান আল-বারীদ; খ. দীওয়ান;
গ. দীওয়ান আল-জুনদ; ঘ. দীওয়ান আল-মাকাতিব।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় শাসনামলে সাম্রাজ্যকে কয়টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল তা লিখুন।
২. আব্বাসীয় যুগে আমীর কীভাবে নিয়োগ হতেন ? লিখুন।
৩. আব্বাসীয় যুগে আমীরের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. আব্বাসীয় যুগে দীওয়ান আল খারায় এর গুরূত্ব তুলে ধরুন।
৫. আব্বাসীয় যুগে দীওয়ান আল-বারীদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক আমীরের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

পাঠ ঃ ৬

আব্বাসীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- আব্বাসীয় খিলাফতের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন;
- আবাবাসীয় খিলাফত ও উমাইয়া খিলাফতের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন;
- আব্বাসীয় আমলে কীভাবে আরবদের প্রভাব কমে যায় তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

সুদীর্ঘ ৫শ' বছরের খিলাফতকালে আব্বাসীয়দের দ্বারা অনেক রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সংঘটিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তারা অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাদের পক্ষ থেকে অনেক দুর্বলতাও প্রদর্শিত হয়েছে। নিম্নে আব্বাসীয় সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল।

১. রাজতন্ত্রের ধারক-বাহকঃ আব্বাসীয়রাও উমাইয়াদের ন্যায় রাজতন্ত্রের ধারক-বাহক ছিলেন। প্রকৃত খিলাফত প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন। ফলে আব্বাসীয়গণ তাঁদের সরকারকে খিলাফতের পরিবর্তে দৌলাহ নামে অভিহিত করেন। "দৌলাহ" শব্দের অর্থ "নব রাষ্ট্র"।

২. ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী সিরিয়া থেকে বাগদাদে স্থানান্তরঃ প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস আল-সাফফাহ কুফাবাসীদের বিশ্বাস করতে পারেন নি। সেই কারণে তিনি খুরাসানের "হাম্মাম আঈন" নামক স্থানে তাঁর বাসস্থান স্থানান্তর করেন। সেখান হতে অল্পদিন পরেই তিনি 'হিরা' নামক স্থানে সদর দপ্তর স্থাপন করেন। সেখান হতে তিনি পুনরায় "হাশিমিয়া" নামক স্থানে তাঁর আবাসস্থল স্থানান্তর করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আবু জা'ফর আল-মানসূর বাগদাদকে স্থায়ী রাজধানীর মর্যাদা দান করেন। এভাবে উমাইয়া শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী দামেস্ক থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদ হয়। ফলে সিরিয়ার প্রাধান্য দিন দিন কমতে থাকে এবং বাগদাদের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. সিরীয় প্রভুত্ব হতে ইরাকের মুক্তি লাভঃ উমাইয়া আমলে প্রায় শত বার প্রচেষ্টা চালিয়েও ইরাকীরা সিরীয়ার প্রভূত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। বাগদাদ ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় ইরাক সে প্রভুত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় এবং আব্বাসীয় সরকার ইরাকপক্ষীয় ও সিরীয় বিরোধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪. অনারবগণের প্রাধান্য বিস্তারঃ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবদের প্রাধান্য এবং সুযোগ-সুবিধা খর্ব হয়ে পড়ে এবং এতদিনের বঞ্চিত অনারবগণ সরকারে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৫. ইসলামের আন্তর্জাতিকতার প্রকাশঃ আরব এবং অনারব বৈষম্য বিদূরিত হয়ে ইসলাম আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ইরানী ও খুরাসানীগণ, যাদের সাহায্যে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তারাও আরবদের মত সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন এবং আরবদের প্রভাব দিন দিন খর্ব হতে থাকে। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়েলহাউযেন মন্তব্য করেন, "আন্তর্জাতিক ইসলামের ছদ্মবেশে আরবদের উপর ইরানবাদ প্রভাব বিস্তার করে।"

৬. আব্বাসীয় সরকারের প্রকৃতি ছিল অনারবীয়ঃ আব্বাসীয় খলীফাগণ যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তার প্রকৃতি ছিল অনারবীয় ; পক্ষান্তরে উমাইয়া সরকারের প্রকৃতি ছিল আরবীয়। উমাইয়া যুগে বংশ পরম্পরার যথেষ্ট মূল্য ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় যুগে বংশ পরম্পরার তেমন কোন মূল্য ছিল না। আব্বাসীয় খলীফাগণ মনে করতেন যে, মহানবীর উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁদের শাসন করার স্বর্গীয় অধিকার রয়েছে এবং সকল মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের একই সম্পর্ক।

৭. দরবারে মোসাহেবদের বাড়াবাড়িঃ পূর্বের তুলনায় আব্বাসীয়দের দরবারে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খলীফাগণ প্রায়শই মোসাহেব পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতেন। দরবারে ক্রমানুসারে হাশেমী, খুরাসানী এবং সামরিক প্রধানদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীদের প্রাধান্য ও প্রভাব রাজনীতির ধারা অত্যন্ত জটিল করে তোলে।

৮. সরকারের মধ্যে প্রভাবশালী শ্রেণীর সৃষ্টিঃ আব্বাসীয় শাসনামলে সরকারী অফিসারগণ একটা স্থায়ী প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। তাদের শিরোভাগে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই মন্ত্রীগণই পরবর্তীকালে খলীফার হয়ে যাবতীয় সরকারী কার্য সম্পাদন করতেন ; খলীফা বেঁচে থাকতেন কেবল খুতবা ও বক্তৃতায়।

৯. খলীফার দরবারে অনারবীয় রীতির প্রচলনঃ কতিপয় আব্বাসীয় খলীফার দরবারে সুষ্ঠুভাবে ইরানী প্রভাব পড়েছিল। খলীফার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছিল দরবারে জল্লাদ নিয়োগ করে। খলীফার হুকুমমাত্র আসামীর শিরচ্ছেদ করে সে ঘাতক খলীফার ক্ষমতার প্রতাপ প্রদর্শন করত। তাছাড়া দরবারে গণক রাখা হতো ভবিষ্যৎ বাণীদাতাগণ বিশেষভাবে সামরিক অভিযানে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করত।

১০. পোস্টমাস্টার নিযুক্তিঃ আব্বাসীয় দরবারের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পোস্টমাস্টার নিযুক্তিকরণ। পোস্ট মাস্টারগণ একই সঙ্গে গোয়েন্দার কার্যও করত। এমনকি প্রাদেশিক গভর্নরদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের বিবরণও তারা গোপনে খলীফার গোচরে আনত।

১১. ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাঃ আব্বাসীয় শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, আব্বাসীয় খলীফাগণ মনে করতেন যে, তাঁরাই ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা হাদীস বিশারদ পন্ডিতদের মদীনা হতে বাগদাদ যেতে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিতে প্রয়াসী হন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস উচ্চে তুলে ধরেন এবং সমস্যা ও বিচারাদি শরীয়াতের বিধান অনুসারে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন।

১২. শী'আদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতাঃ প্রথম হতেই আব্বাসীয়গণ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা শী'আ ইমামকে খিলাফতদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শী'আদের সাহায্য লাভ করে উমাইয়াদের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়; কিন্তু সিংহাসন লাভ করে সে প্রতিশ্রুতি তারা আর রক্ষা করেনি, বরং সেই ইমামকে খলীফা মানসুর হত্যা করে নিজেদের পথ নিষ্কন্টক করেছিলেন। আলী, আবু মুসলিম প্রভৃতি যে সকল সেনাপতির সাহায্যে তাঁরা ক্ষমতা লাভ করেন, তাদের কাউকেই তারা জীবিত রাখেন নি। এমনকি খুরাসানীদের দমন করার জন্য তারা তুর্কীদের প্রাধান্য দেন এবং খুরাসানীদের দমন করে নিজেদের পথ পরিস্কার করেন।

১৩. আব্বাসীয় খলীফা মানসুর মুসলমানদের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের জন্য এবং ক্ষমতায় আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই কারণে তাঁরা ছিলেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেতা। আব্বাসীয় আমলে খিলাফত অধিকতর আকর্ষণীয় হয় এবং খলীফাকে যিল্লুল্লাহ 'আলাল আরদ' বা জমিনে আল্লাহর ছায়া বলা হতো।

১৪. সামরিক প্রতিভার লোভ এবং খিলাফতের অখন্ডতা নষ্টঃ আরব জাতি একটি সামরিক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং উমাইয়া যুগ পর্যন্ত আরবগণ এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিশাল অংশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে অখন্ড খিলাফতের অধিকারী হয়। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে একদিকে যেমন আরবগণ সামরিক প্রতিভা হারিয়েছিল, অপরদিকে তেমনি খিলাফতের অখন্ডতাও ইবনষ্ট হয়েছিল।

১৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাঃ আব্বাসীয় শাসনকাল জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার দিক দিয়ে সর্বাধিক উন্নতিলাভ করে। উমাইয়া শাসনকালে বিজয় অভিযান ও গৃহযুদ্ধের জন্য জ্ঞানানুশীলনের দিকে তত মনোযোগ দেয়া সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু বুদ্ধিমান মাওয়ালীগণ সে যুগে অবহেলিত ছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তিও লাভ করে এবং তারা শুধু তার ভিত্তিতে নয় বরং আরবদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে জ্ঞানচর্চা শুরু করেন ও ইসলামী সভ্যতায় অনন্য অবদান রাখেন।

১৬. তুর্কীদের প্রভাবঃ পারসিকদের পাশাপাশি তুর্কীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিও আব্বাসীয় যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পারসিক প্রভাব ক্ষুণ্ন করার ও পারসিক পরিবেষ্টন হতে মুক্তি লাভের জন্য আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল তুর্কীদেহরক্ষী বাহিনী গঠন করে তাদের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং বাগদাদ হতে তুর্কিস্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এই তুর্কীগণই পরে খলীফার দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পর সেলজুক তুর্কীগণ আবার ক্ষমতাসীন হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আব্বাসীয় খলীফাদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. প্রথম আব্বাসীয় খলীফা কে ছিলেন?

ক. আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ; খ. খলীফা মানসূর;
খ. খলীফা হারূন-অর রশীদ; ষ. হিশাম।

২. আব্বাসীয় খেলাফত কালে-

খ. আরবদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; খ. কমে যায়;
গ. পূর্বের মত বহাল থাকে; ঘ. প্রথম দিকে কমে যায় পরে বৃদ্ধি পায়।

৩. আব্বাসীয় খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল-

ক. দামেস্কে; খ. মদীনায়;
গ. কুফায়; ঘ. বাগদাদে।

৪. আব্বাসীয় যুগে সবচেয়ে উন্নতি লাভ করে-

ক. সম্রাজ্য বিস্তারে; খ. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়;
গ. সামরিক দিক থেকে; ঘ. আধ্যাত্মিক দিক থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয়দের উল্লেখযোগ্য ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. আব্বাসীয়দের যে কোন এমন ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন যা উমাইয়াদের সম্পূর্ণ বিপরিত।
৩. আব্বাসীয় আমলে অনারবদের পুনপ্রতিষ্ঠত হওয়া সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় খিলাফতের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. আব্বাসীয় শাসনামলের সাথে উমাইয়া আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তুলনা করুন।